Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 718 - 726
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা সাহিত্যে সমকামিতা ও তৃতীয় লিঙ্গের এক মনস্তাত্ত্বিক পাঠ

প্রিয়া দাস
Email ID : priyadasrgu@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Homosexuality, Gey, Lesbian, Sexual interest, Sexual attraction, Voyeur, Taboo, Bisexual.

Abstract

Homosexuality is a sexual interest and attraction to members of one's own sex. The word 'gay' often used for male as a synonym for homosexual, and female homosexuality is referred to as 'lesbian'. The term 'Homosexuality' was coined in the late 19th Century by an Austrian- born hungarian psychologist, karoly Benkert. Now a days Homosexuality gets a subject of Bengali literature. Different authors have highlighted this issue in different ways in their writing. This topic of homosexuality has found its place not only in Bengali literature, but also in literature in other languages. So, here we will try to discuss "A psychological study of homosexuality and the third gender in Bengali literature" through our Study.

Discussion

সমলিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি যৌন আকর্ষণই হল সমকামিতা বা হোমোসেক্সুয়ালিটির ভিত্তি। অস্ট্রিয়ান বংশোদ্ভূত হাঙ্গেরিয়ান মনোবিজ্ঞানী কেরলে মারিয়া বেনকার্ট দ্বারা প্রথম 'সমকামিতা'[১] শব্দটির উদ্ভব হয়েছিল। মহিলা সমকামীদের বোঝাতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দটি হল 'লেসবিয়ান' এবং পুরুষ সমকামীদের ক্ষেত্রে 'গে', যদিও গে কথাটি প্রায়শ সমকামী মহিলা ও পুরুষ উভয়কে বোঝাতেও সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়।[২]

প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের মধ্যে কিছু গোড়া চিন্তাভাবনা কাজ করে, যা আমাদের জন্মের আদিলগ্ন থেকেই আমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় সমাজ সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে। কিন্তু বর্তমানে মানুষের মধ্যে জ্ঞানের ক্ষুধা ক্রমশ তার বিস্তার ঘটাচ্ছে। যা আমাদের অন্যভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করছে, পাশাপাশি আমাদের মানসিকতায় আনছে আমূল পরিবর্তন।

মনুষ্য সমাজ সৃষ্টির প্রাক্‌কাল থেকেই কিছু মানুষ সমাজের মধ্যে থেকেও সামাজিক পরিচয়হীনতায় জর্জরিত হয়ে বেঁচে রয়েছে। সমাজের কাছে তাদের একমাত্র পরিচয় তারা 'তৃতীয় লিঙ্গ'। মনুষ্য সমাজে বেঁচে থেকেও মানুষের সামান্য সন্মানটুকু তারা পায় না। তাদের সমাজ দেগে দেয় 'যৌন বিকলাঙ্গ' বলে। সমাজের তথাকথিত মানুষের কাছে এদের একটাই পরিচয় 'হিজড়ে' বা 'নপুংসক' বলে। কিন্তু সময় পালটাচ্ছে, যুগ এগিয়ে চলছে যার ফলস্বরূপ মানুষও ধীরে ধীরে তাদের মন মানসিকতায় বদল আনতে সক্ষম হচ্ছে। তৎসত্ত্বেও মানুষের মন থেকে গোঁড়ামির অন্ধকার ছায়া মুছে যায়নি। এখনও সমাজের কাছে মানুষের পরিচয়, মানুষের মর্যাদা তার ব্যক্তিগত লিঙ্গকেই কেন্দ্রায়িত করে।

প্রাচীনকালে মানুষের মধ্যে যৌনতা সম্পর্কিত কোনো পৃথক ধারণা ছিল না। শারীরিক মিলন ছিল তাদের কাছে একটা সহজাত প্রবৃত্তি মাত্র। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে, যুগ যত পাল্টেছে, মানুষের মধ্যে যৌনতা সম্পর্কে নানাধরণের কৌতুহল মূলক প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে। আর এই প্রশ্নের থেকেই জন্ম নিয়েছে নানা ধরনের নতুন নতুন তত্ত্ব। মানুষের মধ্যে তৈরী হয়েছে যৌন সম্পর্কিত নানান পরিকল্পিত ভাবনা।

মানুষের জন্মের আদিলগ্ন থেকেই দেহজ সঙ্গমকে শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের প্রয়োজন বলে মনে করা হত, কিন্তু বিবর্তনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর ধীরে ধীরে সেই দৃশ্য পাল্টে যেতে শুরু করে, মনোদৈহিক আনন্দ এখন যৌনতার ক্ষেত্রে এক ব্যাপক স্থান অধিকার করেছে। তবে যৌনতা বিষয়ক আলোচনায় একটা দিক চিরকালই উপেক্ষিত থেকে যায় যা খুব সীমিত সংখ্যক মানুষের মধ্যেই লক্ষণীয়। যেখানে মানুষ তার বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি কোনো প্রকার দৈহিক আকর্ষণ অনুভব করে না, বরং তার সম লিঙ্গের মানুষের সাথে দৈহিক মিলনে চরমতর সুখ ও পরিতৃপ্তি অনুভব করে। ভিন্ন রুচি সম্পন্ন যৌনতার এই দিকটিকে আমাদের তথাকথিত সমাজ চিরকাল অস্বাভাবিক মনে করে এসেছে, এবং সমাজের এক কোণে করে রেখেছে যা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়।

আমাদের তথাকথিত সমাজ সমকামি মানুষদের সাথে নিজেদের একটি ব্যবধান চিরকাল বজায় রেখে এসেছে এবং আজও সেই ধারা প্রবহমান। সমাজই এই ধরনের মানুষদের জীবনকে চরমতম যন্ত্রণাময় করে তুলেছে, তাদেরকে আমাদের সমাজের এক টুকরো মাটিও ছেড়ে দেওয়া হয়নি যা তাদের জীবনকে অসহনীয় কষ্টকর করে তুলেছে। কিন্তু সাহিত্যে তৃতীয় লিঙ্গ হোক বা সমকামী মানুষের বেদনাময় যন্ত্রণার কাহিনী, তা পাঠ করে, তার থেকে রসগ্রহণ করতে পাঠকেরা চিরকাল উৎসাহিত। সাহিত্যে এই বিষয়গুলো তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সফল হয়েছে। তাই পুরান থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্য সবেতেই, এই ধরনের উপেক্ষিত মানুষদের জীবন কাহিনী স্থান করে নিতে পেরেছে।

বাংলা কথা সাহিত্যে সমকামিতার মতো বিষয়কে গল্প বা উপন্যাসের মাধ্যমে চিত্রায়িত করা সত্যই নিঃসন্দেহে একটি কঠিন বিষয়। তবে এ বিষয়ে অনেক লেখকই বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের মধ্যে এমনই একজন লেখিকা হলেন তিলোত্তমা মজুমদার, তাঁর লেখা ‘তুবুল তুই’ গল্পে, যেখানে আমরা দেখেছি কিভাবে দুই বন্ধু শিবতোষ ও প্রীতিময় একসঙ্গে চোদ্দটি বছর তাদের ছাত্র জীবন কাটিয়ে ধীরে ধীরে তাদের কর্মজীবনে অনুপ্রবেশ ঘটে। এ পর্যন্ত সবকিছু ঠিক থাকলেও শিবতোষের মনে এক অজানা আতঙ্ক কাজ করে প্রীতিময়ের বিয়ের কথা শুনে। শিবতোষের মনে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা ডানা বাধে এই ভেবে যে, প্রীতিময়ের ওপর অন্য কেউ ভাগ বসাতে আসছে, যার অধিকার হয়তো শিবতোষের চাইতেও বেশি। প্রীতিময়কে আর সে রোজ সকালে দেখতে পাবে না। না বলতে পারা এক অজানা ভয় পেয়ে বসে শিবতোষকে। বিয়ের পর থেকে অবস্থা আরো ভয়াবহ হয়ে উঠতে থাকে প্রীতিময় ও তার স্ত্রী তিয়াসাকে একান্তে দেখতে পেলে সে অস্বাভাবিক চিৎকারে ফুঁসে ওঠে, কারণ তার মনে হয় যে প্রীতিময় শুধু তার, তাকে অন্য কেউ অধিকার করে বসেছে। এছাড়াও রাতে প্রীতিময় ও তিয়াসার ঘরের সামনে গিয়ে শিবতোষের দাঁড়িয়ে থাকা, প্রীতিময়কে নিয়ে তিয়াসার সাথে তর্ক-বিতর্ক প্রভৃতি বিষয়গুলি উপন্যাসের ঘটনাকে আরো জটিল করে তুলতে থাকে। শেষপর্যন্ত প্রীতিময় তার স্ত্রীকে নিয়ে অন্যত্র ভাড়া চলে যায়, অপরদিকে শিবতোষও তার জন্য মেয়ে দেখে বিবাহ করে নেয়। কিন্তু এরপরও পাঠকেরা দেখতে পাবেন, যে শিবতোষ সেই বহু প্রতিক্ষিত বিয়ের রাতেও ফুলে সজ্জিত শয্যায় প্রথম নারী সঙ্গকে অনায়াসে উপেক্ষা করে চলে যায় ছাদে, আর বলতে থাকে –

> “তুবুল, তুই আমার। তোকে আমি প্রবল ভালোবাসি, তুই?”[৩]

শিবতোষ সহ অন্যান্য প্রিয়জনেরা প্রীতিময়কে তুবুল বলে ডাকত। আর এতদিন পর শিবতোষের মুখে আমরা শুনতে পাই তার অন্তরাত্মার চরমতম আকুতি, যেখানে সে স্বীকার করে যে তার সমস্ত সত্তা জুড়ে শুধু প্রীতিময় অন্য কারো স্থান সেখানে নেই।

বাংলা কথা সাহিত্যে সমকামিতা বিষয়ক রচনার প্রসঙ্গ উঠবে আর শিবরাম চক্রবর্তীর কথা উঠবে না, তা হতেই পারে না। শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা ‘ছেলে বয়সে’ উপন্যাস, এ বিষয়ক একটি মাইলস্টোন স্বরূপ। এই উপন্যাসে একদিকে দেখা যায়, বাংলার ছেলেদের স্বাধীনতা পাবার জন্য তাদের মধ্যে চূড়ান্ত উদ্যামতা। অপরদিকে দেখা যায়, কলকাতার বুকে

গড়ে ওঠা একটি বয়েজ হোস্টেলের কাহিনী, যা উপন্যাসে মুখ্য হয়ে উঠেছে। যেখানে আমরা দেখতে পাই, কিশোর বয়সী অশান্ত ও মোহন নামক দুটি চরিত্রকে। অশান্ত এবং মোহন কেউই একে অপরকে চিনত না, হঠাৎ তাদের দেখা হয় একটি থিয়েটার হলে প্রথম দেখাতেই অশান্তর মনে এক আশ্চর্য অনুভূতির সঞ্চার হয়, যা পাঠকদেরকে অন্যভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। অশান্তর মনের গভীরে চলতে থাকে মোহনের তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসির কথা। অশান্ত ভাবতে থাকে কীভাবে মোহনের সাথে একটু কথা বলা যায়, এছাড়াও আরও রোমাঞ্চকর ভাবনা তার মনে উঁকি দিতে থাকে। যা পড়ে যে কোনো পাঠকের মনে হতে পারে কোনো যুবকের মনে কোনো যুবতীকে নিয়ে যে রোমান্টিক অনুভূতির সঞ্চার হয় এ তার চেয়ে কোন অংশেই কম নয়।

এরপর ধীরে ধীরে নানান চড়াই-উতরাই পেরিয়ে উপন্যাসের কাহিনী অগ্রসর হতে থাকে। এবং ঘটনাক্রমে অশান্ত ও মোহন দুজনের মধ্যে এক বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, পরবর্তীতে তারা একই হোস্টেলে থাকতে শুরু করে। কিন্তু তাদের বন্ধুত্ব ছিল কিছুটা অন্যরকম, বন্ধুত্বের আড়ালে অশান্তের কাছে মোহন যেন তার প্রেয়সীর প্রতিমা। অশান্ত ও মোহনের একসঙ্গে একান্তে সময় কাটানো, সকলের আড়ালে অশান্তর মোহনকে খাইয়ে দেওয়া, আর মোহনের প্রতি অশান্তর প্রেমিক সুলভ উক্তি ও ব্যবহার যেন তারই সাক্ষী বহন করে। তারা দুজনে একসাথে থাকলে তাদের মনে জেগে ওঠে অপরূপ মোহ মুগ্ধকর অনুভূতি যার ফলে অশান্ত একদিন হঠাৎ মোহনের গলা জড়িয়ে ধরে মোহনের রাঙা ঠোঁট দুটিতে এক নিবিড় চুম্বন রেখা একে দেয়।কিন্তু এই অভাবিত আত্মপ্রকাশের বিপুল আনন্দ তারা সহ্য করতে পারল না, তার অসহ্য আবেগ যেন তাদের একটু আঘাতই করল। যে পরম মুহূর্তটি তাদের ভাবি মুহূর্তগুলিকে অমৃতে মধুময় করে দিল তাকে প্রথম মুহূর্তে তারা হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারল না, — পরশমনির যে স্পর্শ তাদের সারাজীবন সোনায় সোনা করে দিল প্রথম ক্ষণে তার আঘাতের বেদনাটাই যেন বেশি করে বাজল। কিন্তু অপরদিকে মোহনের মনে চলছিল অন্য কথা, কেন সে অশান্তর আদরের প্রতিদান দিতে পারল না? কেন বুকভরা একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রিয়তমকে তার অন্তরের কথা জানাতে পারল না।

উপন্যাসের এই কাহিনী যতটা স্নিগ্ধ মনমুগ্ধকর, ঠিক তেমনই এর বিপরীতে ঘটে চলেছে এক পৈশাচিক কামনার ছবি। সেই বয়েজ হোস্টেলেই থাকে তারেশ বলে একটি ছেলে যে চ্যাম্পিয়ন ফুটবলার। মোহনের মতো নারী সুলভ নমনীয় রাঙা ছেলেদের প্রতি তার নজর। সে সুযোগ পেলেই মোহনকে অধিকার করে বসে, মোহনকে তার ভালোবাসায় ক্ষতবিক্ষত করে তোলে, যা মোহনের কখনোই পছন্দ নয়।

মোহন ভয়াতুরের মত বিবর্ণ মুখে অশান্তর কাছে এলে, অশান্ত তাঁর হাত ধরে কাছে বসিয়ে বলে, -

> “এত ভয় পেয়েছ কেন? বসো।”[৪]

মোহনের প্রতি তারেশের এই পৈশাচিক কামুক ব্যবহারে অশান্তর প্রতিক্রিয়া যে তার অন্তরের প্রেমিক রূপের বহিঃপ্রকাশ, তা পাঠক সহজেই অনুভব করতে পেরেছে আর মোহনও প্রেমিক অশান্তর কাছেই খুঁজে পেয়েছে তাঁর নিরাপদ আশ্রয়।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি দিক না বললেই নয়, যেখানে ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসের শুরুতেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘শ্রীকান্ত' উপন্যাসের আখ্যায়িকা আলোচনা করে বলেছেন, -

> “শ্রীকান্ত বড় হলে, লোকে তাকে জিজ্ঞেস করল যে তার জীবনে কাকে এবং তাকে কে প্রথম ভালোবেসেছে, শ্রীকান্ত উত্তর দিল, রাজলক্ষ্মী, প্রশ্নকর্তা উত্তর শুনে বিমুগ্ধই হলেন, কিন্তু বিমূঢ় হলেন কেবল বিধাতা - হতভাগ্য ইন্দ্রনাথ কে স্মরণ করে। শ্রীকান্ত সারাজীবন ধরে রাজলক্ষ্মীরই পুজো করে চলল, কিন্তু ছেলে বয়সে ইন্দ্রনাথই তাকে ভালবাসতে শিখিয়েছে এবং যার আকর্ষণে মৃত্যুর মুখ পর্যন্ত সে বারবার অভিসারে বেরিয়েছে, সেই প্রথম প্রিয়ের প্রতি তার প্রথম প্রেম যে প্রথম প্রিয়ার চাইতে কিছু মাত্র কম ছিল তাই বা কে বলবে?
>
> কেবল চোখে নয়, মুখে নয়, মস্তিষ্কে নয়, হৃদয়ে নয় – সমুদয় স্নায়ু-শিরা-মজ্জায় জড়ানো ছেলে বয়সের এই ভালোবাসা। ছেলেরা মাকে যেমন ভালোবাসে তেমনি অগোচর ও একান্ত। ছেলেবেলার এই স্বপ্নের কাহিনী বড়বেলার স্মৃতির বাহিনীর মধ্যে হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যায় না।”[৫]

বাংলা সাহিত্যে নারীসমকামিতাকে কেন্দ্র করে তিলোত্তমা মজুমদারের লেখা 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' এক অনন্য উপন্যাসের মর্যাদা পেয়েছে। এই উপন্যাসটি ১৪০৯ আনন্দবাজার পূজাবার্ষিকী সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। আত্মনির্ণয় বিপন্নতা যা এই উপন্যাসের মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। নারী সমকামিতাকে কেন্দ্র করে বেড়ে ওঠা এই উপন্যাসটি পাঠকের কাছে মেলে ধরেছে এক নতুন দিক। উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে শ্রুতি, যাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসটি নানাদিকে তার অঙ্গপ্রসার ঘটিয়েছে। আত্মনির্ণয় বিপন্নতা, যে অসুখ শ্রুতি বসুকে নিরন্তর অপূর্ণতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। মফস্বল স্কুলের ভালো ছাত্রী শ্রুতি, তাঁর মাকে হারিয়েছে ছোটবেলায়, রয়েছে শুধু বাবা আর জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ছোট ভাই ওলু। মা মারা যাবার পর সংসারের পুরো দায়িত্ব এসে পড়ে শ্রুতির ওপর। সে ভালো নম্বর পেয়ে কলকাতায় ভালো কলেজে দর্শন নিয়ে পড়ার সুযোগ পেলেও সংসারের কথা ভেবে সে যেতে নারাজ। কিন্তু শ্রুতি তার বাবার ক্লান্তি টের পেয়েছিল, টের পেয়েছিল তার ওপর বাবার নির্ভরতা। দূরের যেখানে আকাশ আর মাটির মিশে যাওয়া সেখানে চোখ রেখে শ্রুতি ক্রমশ হয়ে উঠছিল প্রয়োজনীয় ভবিষ্যৎ যা ওলুকে ঘিরে থাকবে, শ্রুতিকে বাঁচাবে, বাবাকে ছুটি দেবে।শ্রুতির কলকাতায় পড়তে যাওয়াটা তার ও তার পরিবারের জন্য যে কতটা জরুরী তা সে বুঝতে পেরেছিল। এরপর শ্রুতি কলকাতার এক কলেজে দর্শন নিয়ে পড়তে শুরু করে এবং সেখানে হোস্টেলে পরিচয় হয় দেবরুপা আর শ্রেয়সীর সঙ্গে। এই প্রথম গ্রামের মেয়ে শ্রুতি এই হোস্টেলেই সমকামিতার পাঠ পায়। শ্রুতির দুই রুমমেট দেবরুপা আর শ্রেয়শ্রীর পরস্পরের প্রতি অনিয়ন্ত্রিত আকর্ষণের মাধ্যমে যেসব মুহূর্ত রচনা করেছিল, তারই ঘূনাবর্তে শ্রুতি বন্যায় বিধ্বস্ত নৌকার মতো টুকরো টুকরো হয়ে ভাঙছিল অথচ এই ভাঙন হন্তারক ছিল না। শ্রুতি নিজের বিবিধ খন্ডের মধ্যেই একদিন নির্ণয় করেছিল নিজেকে।

উপন্যাসের কাহিনী মূলত দুটি পর্বে বিভাজিত – 'পূর্বশ্রুতি' এবং 'পরশ্রুতি'। প্রথম পর্বের শ্রুতি বসু হল মফস্বলের স্কুলে পড়া এক ভালো ছাত্রী, যে অনেক স্বপ্ন নিয়ে কলকাতায় পড়তে আসে কারণ তাকে একটা চাকরি পেতে হবে। তাঁর নিজের ও তাঁর পরিবারের দায়িত্ব নিতে হবে। আর দ্বিতীয় পর্বের শ্রুতি বসু দর্শণ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যার সত্যিকারের জীবন দর্শন ঘটেছে, ছাত্রাবস্থার পরবর্তীকালে সে একটি সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থায় চাকরি পেয়ে সংসারের হাল ধরে।

উপন্যাসের প্রথম পর্বে দেখা যায়, ছাত্রীবাসের কুড়ি নম্বর রুমে থাকা শ্রুতি বসু, শ্রেয়সী আচার্য এবং দেবরূপা পাল, যারা সবাই পড়তে কলকাতায় এসেছে। যেখানে শ্রেয়সী হল সম্পূর্ণ মেয়েলী ছাদে গড়া নমনীয় প্রকৃতির আর দেবরুপা হল ঠিক বিপরীত ছোট চুল, ছেলেদের মতো পোষাক পরিহিত, এক চরিত্র। শ্রেয়সী ও দেবরুপার মধ্যে গড়ে ওঠে গভীর বন্ধুত্ব কিন্তু তা যেন আর পাঁচটা বন্ধুত্বের মতো নয়, তার মধ্যে রয়েছে যৌনতার গন্ধ, দেহজ কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার প্রবল ইচ্ছা। দেবরুপা আসলে নারী দেহে পুরুষ প্রকৃতি বহন করছে, ফলত সে তার কামনার পরিতৃপ্তি ঘটায় শ্রেয়সীকে দিয়ে। সে কারণেই দেবরূপা যখন জানতে পারল যে শ্রেয়সী ও শুভ্রনীলের সম্পর্কের কথা তখন দেবরুপা প্রচন্ড ক্ষেপে যায় -

> দেবরুপা বলেছিল, 'ও রোজ কেন আসে?'
> শ্রেয়সী বলেছিল, 'আসুক না তুই তো দেখলি। আমি বেশিক্ষণ কথা বলিনি।'
> — কিন্তু ও রোজ আসবে কেন? ও না এলে তোর চলে না?
> — না, তা মোটেও নয়। কিন্তু ও এলে আমি না বলতে পারি না।
> — হ্যাঁ। তোকে বলতে হবে। তুই বলবি।
> — না। আমি পারবো না।
> — আসলে ও এলে তোর ভালো লাগে সেটা বল।
> — হ্যাঁ, লাগে, ভালো লাগে।[৬]

এভাবেই শ্রেয়সী ও দেবরুপার সম্পর্কের নানান ওঠাপড়ার সাক্ষী হিসেবে থেকে যায় গ্রামের মেয়ে শ্রুতি বসু। দর্শনের ছাত্রী শ্রুতি বসু যেন ধীরে ধীরে বাস্তব জীবনের কিছু অজানা দিকের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে। শ্রুতির মনে প্রশ্ন জাগে, প্রেম আসলে কী? কিভাবে করে প্রেম? শ্রুতি তা জানে না। প্রেম কোন ক্রিয়া পদ নয়। প্রেম করা কোনো প্রক্রিয়া

নয়। হয়তো নিবিড় ভাবে তাকানো – এর নাম প্রেম করা, তীব্র স্পর্শাকাঙ্ক্ষা – তার নাম প্রেম করা। শ্রেয়সী ও শুভ্রনীল করছিল সেই প্রেম। আসলে পুরুষ নারীকে টানলে সে টান অমোঘ, নারী নারীকে টানলে সে অতিক্রমণ সহজ সম্ভব, এই সহজ সত্য সম্পকে দেবরুপা অবগত ছিল না, তাই তাকে কষ্ট পেতে হয়েছিল।

> “শ্রেয়সী ক্রমশ অভিমান ভাঙছিল দেবরুপা মেয়ের। দেবরুপা অভিমান ভাঙছিল শ্রেয়সী মেয়েটির। কাছে টানছিল। দেবরুপা নেমে আসছিল নীচে। আরো নীচে। শ্রেয়সীর বুকের ওপর।”[৭]

দেবরুপা আর শ্রেয়সীর সম্পর্কের সঠিক কোন ব্যাখ্যা শ্রুতি খুঁজে পায়নি। আর শ্রেয়সীও তার অন্তর মনের কাছে স্বীকার করেছে, যে দেবরূপার মত আনন্দ সে শুভ্র নীলের কাছেও পায়নি, যা পাঠককূলকে একেবারেই অবাক করেনি। এরপরে উপন্যাসের পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায়, শ্রুতি যেখানে চাকরি করতো সেখানেই তার সহকর্মী হিসেবে যোগ দেয় দেবরুপা। তবে দেবরুপার চরিত্রের কোন বদল ঘটেনি, এখনও দেবরুপা রয়ে গেছে ঠিক আগের মতোই। দেবরূপা ও সঙ্গীতা দত্তের বন্ধুত্বই তার অকাট্য প্রমাণ। হঠাৎ শ্রুতি দেখতে পায় –

> “দেবরুপার হাত সঙ্গীতার ব্লাউজে খেলা করছিল। আমাকে দেখে হাত সরিয়ে নিল। সঙ্গীতা শাড়ি পরে। আঁচলে গা ঢেকে রাখে। দেবরুপা, আচঁলের মধ্যে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেয়। বদলায়নি। একটি বিন্দুও বদলায়নি ও। ঠিক সঙ্গী জুটিয়ে নিয়েছে।”[৮]

হঠাৎ এতসবের মধ্যে শ্রুতি বুঝতে পারে, তাঁর নিজের জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ভাই ওলু, যার মধ্যে কোন জ্ঞান নেই, বোধ নেই, কিন্তু তার মধ্যেও রয়েছে কাম বোধ। আসলে প্রত্যেকটি মানুষই অপর এক মানুষের সঙ্গ প্রার্থনা করে। কারণ এই যৌন চাহিদা পুরোপুরি ভাবেই প্রকৃতিগত। যার নানাবিধ নজির আমরা প্রত্যহ আমাদের চারপাশে দেখতে পাই।

উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে হঠাৎই আগমন ঘটে, পুরুষ দেহে নারী স্বভাবেচিত ‘ললিতা’র। যার সাথে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হয় সমকামী দেবরুপা। আর এই কামোত্তেজিত অবস্থায় তাদের দেখতে পায় শ্রুতি, যা শ্রুতির কাছে অসাধারণ দৃশ্য বলে মনে হয়েছে –

> “দেবরুপার শাড়ি উঠে গেছে, কোমরে। পা ছড়ানো। ওর কোলে ললিতা। গায়ে শার্ট নেই। বুকে একটি কাপড় কাচুলির মতো বাঁধা। তার ওপর দেবরুপার হাত খেলছে। দুজনের মুখ এক পাশে নামানো। এর ঠোঁট ওর ঠোঁট ঢুকে আছে। কোনও হুঁশ নেই। ...ওরা রাধা-কৃষ্ণ খেলছে। কিন্তু কে রাধা আর কে কৃষ্ণ! আজ কৃষ্ণ রাধা সেজেছে আর রাধা কেষ্টটি সেজে মজা করছে। ...ওরা শরীর প্রকৃতি ছাপিয়ে গেছে। মন-প্রকৃতিতে মিলেছে। চিরন্তন নারীমন চিরন্তন পুরুষ মনে মিলেছে। দেহ-গঠন এখানে বাধা হয়নি। নারী দেহধারী পুরুষ, পুরুষ দেহী নারীকে জড়িয়েছে। জয় প্রকৃতির জয়।”[৯]

শ্রুতি হঠাৎই অনুভব করেছে –

> “তাঁর শরীর জুড়ে এক আশ্চর্য অনুভূতি। আমার, ওই রকম, দেবরুপার মতো, কাঁচুলি ভেদ করতে ইচ্ছে করছে! আমার শ্রেয়সীকে মনে পড়ছে! হে ঈশ্বর, এর নাম যৌন অনুভূতি! হে ঈশ্বর, আমি কি নিজেকে চিনতে পারছি! হে ঈশ্বর, আমি ওদের ঘোর ভাঙ্গিয়ে দিলাম না কেন? সে কি এজন্যই যে আমি যা পারি না, দেবরুপা যা পারে, তা প্রত্যক্ষ করে আমার সুখানুভূতি হচ্ছে!”[১০]

শ্রুতির মনে চলতে থাকে এক চরমতম আত্ম বিশ্লেষণ, তার হঠাৎ মনে হতে থাকে এ কেমন যৌন অনুভূতি। যা এর আগে সে কখনও অনুভব করেনি। তাঁর এই নতুন রূপের সঙ্গে শ্রুতি যেন নিজেকে মেলাতে পারে না। তাঁর মনে হতে থাকে, তবে কি সে এতদিন নিজেকে চিনতেই পারেনি, নিজের যৌন আকাঙ্খা সম্পর্কে সে এতদিন অনভিজ্ঞ ছিল? দর্শনের ছাত্রী শ্রুতির মনে হতে থাকে, এতদিন পরেই কি তাঁর সত্যিকারের আত্ম দর্শন ঘটলো? মনে ও মাথায় হাজারও প্রশ্ন একইসঙ্গে তোলপাড় করে তোলে শ্রুতিকে। সেই মুহূর্তে হঠাৎই তাঁর মনে পড়ে, যে কয়েক বছর আগে ছাত্রীবাসে থাকাকালীন সকলে যে তাকে ‘ভয়ার’ (Voyeur) বলে উঠেছিল, তবে কি তারা সেদিন ঠিকই চিনেছিল শ্রুতিকে? শ্রুতি কি তবে সত্যিই ‘ভয়ার’ (Voyeur)? সে নিজে প্রত্যক্ষ ভাবে যে যৌন সুখ অনুভব করতে অপারগ, তা কি সে ছাত্রীবাসে থাকাকালীন দেবরূপা ও শ্রেয়সীর কামুক কার্যের মাধ্যমে উপভোগ করতো? আর আজ দেবরুপা ও ললিতাকে কামোত্তেজিত

ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে তাঁর মনের গভীরে থাকা ভয়ার শ্রুতি আবার দেখা দিয়েছে? আর সেই কারণেই হয়তো শ্রুতি তাদেরকে বিরক্ত করতে চায়নি। দুটি মানুষের অন্তরের প্রেমিক সত্তা একে অপরকে পেয়ে যেন স্বর্গ সুখ অনুভব করছে। আর তা দেখে শ্রুতিও তাঁর অন্তরে অনুভব করছে এক অজানা সুখ।

তাই শেষে দেখা যায়, চির সত্যের সাক্ষী হয়ে, মধ্যগগনে উদীয়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে শ্রুতি গাইতে থাকে –

“চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে
আমরা ভেবে করবো কি...
চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে–”[১১]

সমকামী সম্পর্কগুলো যে আর পাঁচটা সম্পর্কের থেকে কোন অংশে আলাদা নয়, শারীরিক গঠন সে ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করে না, তা নবনীতা দেবসেন দেখিয়েছেন তার ‘বামাবোধিনী’ উপন্যাসের মাধ্যমে। এখানে আমরা দেখতে পাবো তিন ছোটবেলার বন্ধু সঞ্জয়, রবি ও অংশুমালাকে। তারা একসঙ্গে পড়াশোনা করে। রবি ও সঞ্জয় পরে আই.আই.টি.-তে আর অংশু প্রেসিডেন্সিতে। এরপর রবি ও অংশুমালার মধ্যে প্রেমজ সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। মাতৃহারা অংশুমালাকে রবি আগলে রাখতো মাতৃস্নেহে। উপন্যাসের অপরদিকের কাহিনীতে দেখা যায় - সঞ্জয়, মালিনী নামের এক মারাঠি মেয়েকে বিবাহ করে, তাদের একটি কন্যা সন্তানও হয় তার নাম দেওয়া হয় পুষ্পাঞ্জলী।

হঠাৎ এরপরই উপন্যাসের কাহিনীতে নেমে আসে বিপর্যয়। যার প্রভাব সহ্য করতে হয়েছে প্রত্যেকটি চরিত্রকেই। পিতৃ-মাতৃহীন অংশুমালা যখন রবিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই রবি তাঁর জীবন থেকে চলে যায়। অংশু হঠাৎই রবির একটি চিঠি পায়, যেখানে রবি নিজেই বলছে যে সে সমকামী আর তার আসল প্রেম সঞ্জয়, তাকে ছাড়া সে বাঁচতে পারবে না। এই ভাবেই পিতৃমাতৃহীন অংশু তার ভালোবাসার শেষ অবলম্বনকেও হারিয়ে ফেলে। প্রকৃতির এই অমোঘ ভালোবাসার কাছে হেরে যায় সবকিছু।

লেখিকা একটি বিষয় পাঠকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, যে সমাজের তৈরি করা কিছু বিধি ব্যবস্থায়ই মানুষের দুঃখের মূল কারণ। সমাজ ঠিক করে দেয়, আমাদের কি করা উচিত আর কী নয়? রবির লেখা চিঠিই তার স্পষ্ট প্রমাণ –

> “কোন নারীর সঙ্গে প্রেম যদি ভেঙে যায়, ভুবনের সহানুভূতি ছুটে আসে। কিন্তু আমাদের এই হতভাগ্য খেয়াল ছাড়া প্রেম ভেঙে গেলেও সহানুভূতি দেখাবে না কেউ, বলবে – ঠিকই তো হয়েছে। যেমন ভেঙেছিল প্রকৃতির বিধান। কিন্তু এটাই যে আমার নিজস্ব প্রকৃতি। তার বিধান মতোই যে আমি চলেছি, সে কথাটা বোঝাবার জন্য কেউ দাঁড়িয়ে নেই। দুটি শব্দে সমকামী প্রেমিকরা সমাজে চিহ্নিত, ‘বিকৃত’ আর ‘বিপজ্জনক’। কোনটাই ভালোবাসার সঙ্গে যায় না।”[১২]

‘বামাবোধিনী’ উপন্যাস রচনার পর নবনীতা দেবসেনের লেখা ‘অভিজ্ঞান’[১৩] উপন্যাসে এসে আমরা বুঝতে পারি দিন বদলাচ্ছে। ধীরে ধীরে মানুষ সমাজের নীতি নিয়ম শৃঙ্খলাকে ভেঙে নিজের ভালো-মন্দের দিকে দৃষ্টি ফেরাচ্ছে। এই উপন্যাসের নায়িকা হল সঞ্জয় আর মালিনীর মেয়ে পুষ্পাঞ্জলি। পুষ্পাঞ্জলি তার প্রেমিক সৌম্য থাকা সত্ত্বেও সে তার থেকে বয়েজেষ্ঠ্য, বিবাহিতা এক নারী সলমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সৌম্য বিষয়টা যেভাবে সহজেই গ্রহন করে নিতে পেরেছে, ‘বামাবোধিনী’-র অংশুমালা কিন্তু তা পারেনি। এখানে লেখিকা স্পষ্টত দেখিয়েছেন দুই প্রজন্মের মধ্যে ভাবনা-চিন্তার পার্থক্য। সৌম্যর কাছে যেটা সহজ, স্বাভাবিক, অংশুমালার কাছে তা নয়। এই অস্বাভাবিকতার কারণ তাদের সংস্কারবদ্ধ ভাবনা-চিন্তা। তারা কখনও ভাবতেই পারেনি যে দুটি পুরুষ বা দুটি নারীর মধ্যে নতুন কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। তারাও আলাদাভাবে গড়ে তুলতে পারে তাদের ভালোবাসার কোন ভিন্ন জগৎ।

উপরিউক্ত যতগুলো উপন্যাস নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি প্রত্যেকটি নারী বা পুরুষ সমকামিতাকে কেন্দ্রায়িত করে। এখন আমরা যে উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা করবো তা সমাজের সমকামী, বিষমকামী, উভয়কামী, তৃতীয় লিঙ্গ প্রত্যেক ধরনের মানুষদের নিয়ে। এলজিবিটি মানুষদের জীবনের টানাপোড়েনের কাহিনী লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর লেখা 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। উপন্যাসে তিনি খুব নিপুণতার সঙ্গে ‘Sex’ এবং ‘Gender’ এর মধ্যে

পার্থক্য করে দেখিয়েছেন। ‘Sex’ হল পুরোপুরি ভাবেই বায়োলজিকাল বিষয়। আর আমাদের ‘Gender’ নির্ধারিত হয় সমাজের দ্বারা। সমাজই আমাদের ঠিক করে দেয়, আমাদের কীরকম পোশাক পড়া উচিত, কীভাবে কথা বলা উচিত, কেমন ব্যবহার করা উচিত, কারণ সমাজের কাছে পুরুষ ও নারী ভেদে এই বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে এক প্রকট পার্থক্য। আর হঠাৎ যদি কোনো মানুষ এই বাঁধা ছকের বাইরে গিয়ে কিছু করতে যায় তখনই আমরা তাকে অস্বাভাবিক, বিকৃত বলে মনে করি, এমন কি কখনো কখনো আমরা তাদের ভিন্ন যৌনরুচিকে পাগলামি বলে ও মনে করি। ফলত সমাজের নিয়ম বহির্ভূত কোন ভিন্ন যৌন রুচি, ভিন্ন ব্যবহার বা ভিন্ন বেশ-ভূষার মানুষদের সমাজে টিকে থাকা এবং সমাজে মানুষের সমমর্যাদা অর্জন করতে তাদের মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া প্রয়োজন।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর অসাধারণ মায়াময় দক্ষতায় সমাজের সংকট সংকুল মানুষদের অনুভূতিগুলিকে চিত্রায়িত করেছেন। সমাজের শরীর ও শরীরের সমাজতত্ত্ব নিয়ে এক দুঃসাহসিক উপন্যাস এই ‘হলদে গোলাপ’ – যা ২০১২ থেকে ২০১৩ সাল জুড়ে প্রয়াত ঋতুপর্ণ ঘোষ সম্পাদিত রোববার – এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশকালে পাঠক সমাজ বেশ আলোড়িত হয়। কাহিনি বয়নে মানুষের লিঙ্গ পরিচয়ের সমস্যা তুলে আনতে গিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে খুঁজেছেন ইতিহাস, নৃ-বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, শরীর বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব জিনেটিক্স, মিথ-পুরাণ। এক বিশিষ্ট সমালোচক বলেছিলেন – ‘স্বপ্নময়ের গল্প আমাদের শেকড় খোঁজার কোদাল’। কাহিনীর পরতে পরতে মিশে আছে বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলি। শুধু বাংলা সাহিত্য কেন, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে এর আগে এভাবে কোন উপন্যাস লেখা হয়নি।

উপন্যাসটি বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে, উপন্যাসের নামকরণের প্রাসঙ্গিকতা জেনে নেওয়া প্রয়োজন যা আমরা উপন্যাসেই পাই। ‘প্রবর্তক’ পত্রিকার লেখক পবন ধল বলেছিল —

> “গোলাপের রং তো আমরা গোলাপিই বুঝি। কিন্তু গোলাপ যদি সাদা কিংবা হলুদ হয়, তবে কি সেটা গোলাপ নয়? আমরাও পুরোপুরি মানুষ। মানুষের সমস্ত ধর্ম আমাদের মধ্যে আছে। আমাদের মধ্যে দুঃখবোধ আছে, সমাজ সচেতনতা আছে; আবার হিংসা–পরশ্রীকাতরতাও আছে। শুধু ব্যক্তিগত যৌনতার ক্ষেত্রে আমরা আলাদা।”[১৪]

উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র হল অনিকেত, যে একটি রেডিও অফিসে চাকরি করে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতেই ঔপন্যাসিক উপন্যাসের কাহিনীর ব্যাখ্যা করেছেন। অনিকেত হঠাৎই অনুভব করে যে, তাদের রেডিওতে এমন একটি অনুষ্ঠান করানো যেতে পারে, যেখানে যুবক যুবতীদের মনের কিছু প্রশ্ন যা তারা সাধারণত কাউকে বলতে পারে না, তারা রেডিওতে তাদের প্রশ্ন উত্থাপন করবেন আর উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন। প্রথমে নানা বাঁধা আসলেও পরে ‘সন্ধিক্ষণ’ নামে একটি অনুষ্ঠান চালু হয় অনিকেতের তত্ত্বাবধানে, যদিও পদে পদে এসেছে নানান প্রতিবন্ধকতা কিন্তু তবুও শেষপর্যন্ত তিনি অনুষ্ঠানটি চালিয়ে নিয়ে গেছেন। অনিকেতের স্ত্রীর নাম শুক্লা, যে সন্তান ধারণে অক্ষম। এছাড়াও তার মধ্যে রয়েছে পুরনো দিনের কিছু গোঁড়া মনোভাব, যেমন স্বামীর সঙ্গে ঋতুস্রাব নিয়ে আলোচনা করাটা তাঁর কাছে লজ্জার বিষয়। এই ধরনের চিন্তা ভাবনা। তবে লেখক তার সুচারু ও পর্যবেক্ষণ দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজের একটি অন্ধকার দিককে ফুটিয়ে তুলেছেন, যেখানে আমরা দেখতে পাই অনিকেত, যে বাড়ির বাইরে সমকামীদের নিয়ে নানান জ্ঞানগর্ভ কথা বলেন, তাদের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলেন, তারাও যে আর পাঁচটা মানুষের মতই স্বাভাবিক এনিয়ে নানান মিটিং মিছিল করে বেড়ান। কিন্তু যখন তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনের পরিবৃত্তে থাকা কিছু মানুষদের সত্যি জানতে পারেন, তখন তিনি তাদের পাশে থাকতে পারেন না। নিজের আদর্শ নীতিবোধ এর সব তখন ভুলে তিনি হয়ে ওঠেন এক অন্য মানুষ। তার জলজ্যান্ত উদাহরণ হল অনিকেতের বাড়ির কাজের মাসির ছেলে দুলাল সে যখন হিজড়ে হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে নির্মমভাবে এইডস রোগে তার মৃত্যু হয়, তখন তাদের প্রতি অনিকেতের কোনো সহযোগী মনোভাব পাঠক দেখতে পাননি, আবার দুলালের ছেলে মন্টু যখন সমকামী এ কথা জানতে পারেন তখন অনিকেত তাদের আশ্চর্যজনক ভাবে বাড়ি থেকে বের করে দেন, কিন্তু অনিকেতের বান্ধবী মঞ্জুর ছেলে পরিমল ওরফে পরি যখন সমকামী একথা জানতে পারে তখন কিন্তু পরীকে নিজের সন্তানসম ভেবে নিতে অনিকেতের কোনো অসুবিধা হয় না কারণ পরী হল বড় ফ্যাশন ডিজাইনার। আসলে লেখক আমাদের দেখাতে চেয়েছেন, আমাদের

ভদ্রসমাজ অর্থনৈতিকভাবে যারা অসচ্ছল তাদেরকে পদদলিত করতে মুহূর্তমাত্র ভাবে না কিন্তু যারা অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী তাদের কর্তৃত্ব সহজেই স্বীকার করে নেয়।

এই ‘পরী’ বা ‘পরিমল’কে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনী অগ্রসর হতে থাকে। পরী জন্মগত ভাবেই পুরুষ লিঙ্গ নিয়ে জন্মেছে, কিন্তু তাঁর মনে রয়েছে নারী প্রকৃতি। পুরুষের কোনো বৈশিষ্ট্যই তাঁর মধ্যে নেই, তার মধ্যে রয়েছে এক মেয়েলীপনা স্বভাব। যা তাঁর মা এর চিন্তার অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছে। মেয়েদের মতো সাজতে, তাদের মতো পোষাক পড়তে পছন্দ করত সে। তার প্রকাশ আমরা দেখেছি, ‘প্রবর্তক’ পত্রিকায় পরীর লেখা এক ‘স্বীকারোক্তি’ নামক কবিতা থেকে, যেখানে সে নিজে বলেছে –

“বয়স তখন তেরোর শেষে
প্রথমবার একা
...
দীপ্ত আমার সুপ্ত শিখা
...
আমার আশা আমার ভাষা
জানি শুধু আমি
জানি না তো জানেন কিনা
স্বয়ং অন্তর্যামী।
মা বোঝে না, কেউ বোঝে না
কোথায় আমার আমি।
ব্যঙ্গ করে বলতে পারো
তুই তো সমকামী।”
-পরী।[১৯]

এই ‘পরী’ চরিত্রটির সবথেকে বলিষ্ঠতম দিক হল তার অপরিসীম জেদ। সে নিজেকে কখনো ছোট মনে করে না। সেই যেদ নিয়েই ফ্যাশন ডিজাইনিং নিয়ে পড়ে চাকরি পায়। যা তাকে সমাজের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিকভাবে অনেক স্ট্রং করে তুলেছে। পরী ভালোবাসে চয়ণ নামের নিপাট সাধারণ স্কুল মাস্টারী করা একটি ছেলেকে এবং তাকেই বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে চয়ণেরও পূর্ণ সম্মতি রয়েছে। যদিও এ নিয়ে তাদের কম ব্যঙ্গ রসিকতার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু তবুও পরী তাঁর সিদ্ধান্তে অটল।

পরী এটাও জানে যে তাদের এ বিয়ে আইন সম্মতভাবে সম্ভব নয় কিন্তু তবুও তারা চায় সামাজিকভাবে বিয়ে করতে। আসলে ছোটো থেকে আর পাঁচটা মেয়ের যেমন বিয়ে নিয়ে নানান স্বপ্ন থাকে পরীরও তেমন ছিল। পরী ও চয়ণের প্রেমে যৌনতার দিকটি খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে লেখক দেখিয়েছেন পরী চায় চয়ণকে পরিপূর্ণ ভাবে সুখ দিতে, তাই সে নিজের ব্রেস্ট ইমপ্লান্ট সার্জারি করিয়েছিল, নিয়মিত ইস্ট্রোজেন ট্যাবলেট খেতো। অবশেষে আসে সেই শুভ দিন ২৭শে শ্রাবণ। অনিকেতের বাড়িতেই বিয়ের সকল আয়োজন হয়, পরী সাজে শাড়ি গহনায় অপরূপভাবে আর চয়ন মেরুন রঙের পাঞ্জাবিতে অবশেষে তাদের বিয়ে হয়। ঔপন্যাসীক বিয়ের ঘটনাটির মাধ্যমে সমাজের ট্যাবু কে ভাঙতে চেয়েছেন। সমাজের সমস্ত বাঁধা ছকের গণ্ডি ভেঙে দুটি প্রেমিক সত্তা এক হয়েছে তাদের শুভ পরিণয়ের মাধ্যমে, যা এর আগে বাংলা উপন্যাসে সেভাবে দেখানো হয়নি।

এ ধরণের উপন্যাসের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলে, মনে পড়ে যায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘মায়ামৃদঙ্গ’ বা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ কিংবা জয় গোস্বামীর ‘যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল’ প্রভৃতি উপন্যাসের কথা, যেখানে পুরুষ সমকামিতা বা নারী সমকামিতা–র বিষয়গুলি উঠে এসেছে লেখকের লেখনীর মাধুরতায়।

বাংলা কথা সাহিত্যে সমকামী প্রেম এই বিষয়টি বারবার উঠে এসেছে, বিভিন্ন লেখকদের হাত ধরে। পূর্বে এই বিষয়টি নিয়ে কিছুটা প্রচ্ছন্নতা থাকলেও, বর্তমানে তা আর নেই। কারণ মানুষ বুঝতে শিখেছে, সমকামী প্রেম কোন অন্যায় বা পাপ নয়। আর পাঁচটা যৌন প্রবৃত্তির মতোই এটি, কিন্তু তা সম লিঙ্গের মানুষের প্রতি। এর মধ্যে কোন বিকৃতি বা অস্বাভাবিকতা নেই। আর প্রেম তো কোনো নিয়ম মেনে বাঁধা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। প্রেম মুক্ত এবং স্বাভাবিক একটি বিষয়। আর সাহিত্যে স্থান পাওয়ার পর সমকামী প্রেম বিষয়টি আরও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে মানুষের কাছে। নানা ভাবে গল্প, উপন্যাস প্রভৃতির মাধ্যমে আমাদের কাছে সমকামী প্রেম বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেখানে দেহ কোন বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না, দেহ ছাড়িয়ে হৃদয়ের ঘরে যার বসবাস, মনটাই হয়ে ওঠে প্রধান।

তাই শুধুমাত্র লিঙ্গ গত পরিচয়ই মানুষের একমাত্র পরিচয় হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আমরা মধ্যযুগের প্রখ্যাত কবি **চণ্ডীদাসের** বলা একটি উক্তি তুলে ধরতে পারি, যেখানে তিনি বলেছেন - "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"[২০] অর্থাৎ আমরা মানুষ এটাই আমাদের একমাত্র পরিচয় হওয়া উচিত।

Reference:

১. https://plato.stanford.edu/entries/homosexuality/
২. https://bn.m.wikipedia.org/wiki
৩. মজুমদার, তিলোত্তমা, তুবুল তুই, কালচিনির উন্মেষ (পত্রিকা) পৃ : ১৫
৪. চক্রবর্তী, শিবরাম, ছেলে বয়সে, প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৩২ (১৯২৫) পরিচ্ছেদ ১৩
৫. তদেব, ভূমিকা
৬. মজুমদার, তিলোত্তমা, চাঁদের গায়ে চাঁদ,সুবীর কুমার মিত্র (প্রকাশক), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লিমিটেড, বসু মুদ্রণ ১৯ এ সিকদার বাগান স্ট্রিট, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫ পৃ. ৭৫
৭. তদেব, পৃ: ৯১
৮. তদেব, পৃ: ২১৮
৯. তদেব, পৃ: ২২৭
১০. তদেব, পৃ. ২২৭
১১. তদেব, পৃ. ২২৮
১২. দেবসেন, নবনীতা, বামাবোধিনী, দেব সাহিত্য কুটির প্রা: লিমিটেড (প্রকাশক), ১৯৯৭ পৃ. ১৫
১৩. দেবসেন, নবনীতা, অভিজ্ঞান, দে'শ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ মে, ২০১২
১৪. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, হলদে গোলাপ, সুধাংশু শেখর দেব (প্রকাশক), দে'শ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, মুদ্রণ,জানুয়ারী 2015 (মাঘ ১৪২১) পৃ. ৭৩
১৫. তদেব, পৃ. ৮০
১৬. তদেব, পৃ. ৮১
১৭. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, মায়ামৃদঙ্গ, দে'শ পাবলিশিং, ৫ম সংস্করণ (২০২১)
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা; বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা: লিমিটেড, ২০১৭
১৯. গোস্বামী, জয়, যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লিমিটেড, ১লা জানুয়ারী ১৯৯৮ (২০১৫)
২০. https://www.prothomalo.com/opinion/column/